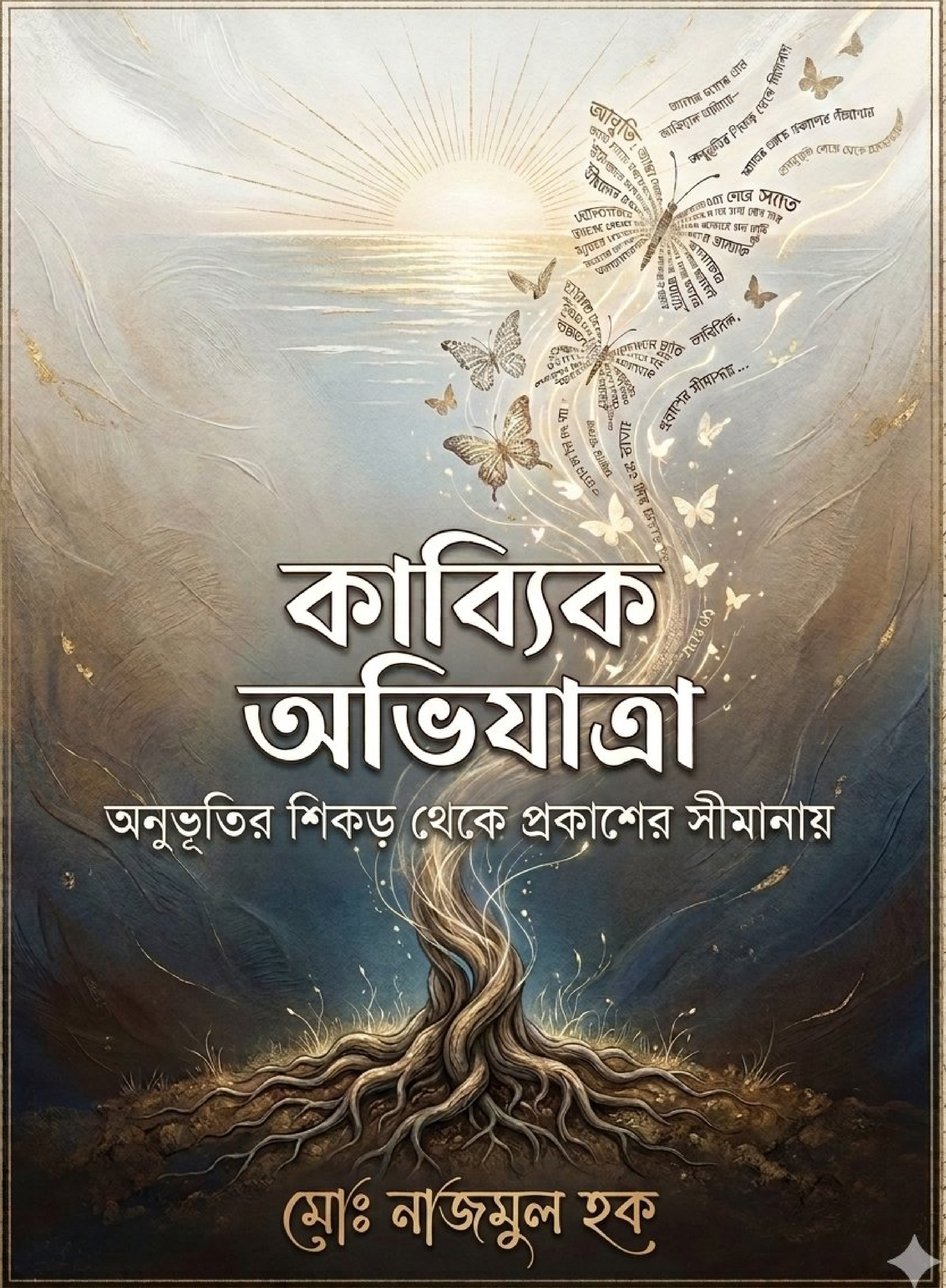

কাব্যিক অভিযাত্রা

অনুভূতির শিকড় থেকে প্রকাশের সীমানায়

মোঃ নাজমুল হক

কাব্যিক অভিযাত্রা

অনুভূতির শিকড় থেকে প্রকাশের সীমানায়

৬ পর্বে সমাপ্ত

লেখক : মোঃ নাজমুল হক
সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি
সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ

Digitally Published Worldwide by

INTERNET ARCHIVE https://archive.org/

Document Identifier ark Code:

13960/s2r199bvc6z

Publish date :

03-05-2026

মুখবন্ধ

কবিতার জন্মলগ্নে কবির কলম যখন সাদা কাগজে আঁচড় কাটে, তখন সেটি আসলে কবিতার দ্বিতীয় জন্ম।

কবিতার প্রথম জন্ম হয় কবির অন্তরের গহীন কোনো অরণ্যে—যেখানে এটা এক অনুভতি মাত্র, এক অমূর্ত ধ্রুবতারা। অনুভূতির সেই আদি স্ফুলিঙ্গ কবির চেতনায় নেমে আসে অনেকটা দৈববাণীর মতো। এ এক বিরল মুহূর্ত, এক অতল নিস্তব্ধতা—যেখানে জাগতিক সব কোলাহল ছাপিয়ে কেবল জেগে থাকে কবির 'কাব্য-সত্তা'। এটি একান্তই এক নিভৃত যাপন। কিন্তু সেই অমূর্ত ভাব যখন হৃদয়ে পুঞ্জীভূত হয়, তখন সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে রূপ পরিগ্রহ করতে; মূর্ত হতে চায় অক্ষরের শরীরে। কবি তখন এক প্রসব-বেদনায় নীল হতে থাকেন, যতক্ষণ না সেই ভাবকে ভাষার আধারে মুক্তি দিচ্ছেন। তাই কবির জন্য এই যাত্রাটি হলো—ভাব থেকে ভাষার দিকে।
অথচ পাঠকের কাছে এই যাত্রা ঠিক উল্টো দিকে । একজন পাঠক যেন উল্টো পথের পথিক। পাঠককে পাড়ি জমাতে হয় শব্দের কূল বেয়ে সেই আদি ও অরূপ অনুভবের খোঁজে, যা একদা কবির হৃদয়ে

INTERNET ARCHIVE

খেলা করেছিল। এটি যেন এক ত্রিকোণ পরিক্রমা। কবির সেই আদিম ও অকৃত্রিম আবেগ সরাসরি পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করার কোনো অতিলৌকিক পথ নেই; মাঝখানে একটি সেতুর প্রয়োজন, আর 'ভাষা' হলো সেই সেতু।

এই বইটি আসলে সেই মহাযাত্রার উপাখ্যান, যা কবির আত্মা থেকে ভাষার অলিন্দ হয়ে পুনরায় পাঠকের আত্মার দুয়ারে করাঘাত করে। ভাষার এই মাঙ্গলিক মাধ্যমে দাঁড়িয়ে থাকা মুখোমুখি দুটি আত্মার মধ্যে এক অদৃশ্য কিন্তু নিবিড় যোগসূত্র স্থাপনই এই গ্রন্থের মূল সুর।

সূচি

১. প্রথম স্ফুলিঙ্গ: কবির নিভৃত হৃদয়ের প্রথম অলোড়ন

২. অন্তর্নিহিত আর্তি: অরূপের রূপ পরিগ্রহের ব্যাকুল আকাংখা

৩. মুক্তির আবাহন: যখন কলম প্রথম কথা বলে ওঠে

৪. শব্দের সীমাবদ্ধতা: অনুভূতির এক খণ্ডিত অবয়ব

৫. প্রত্যাবর্তনের পথ: শব্দের শৃংখল থেকে পাঠকের অনুভূতিতে ফেরার যাত্রা

৬. অন্তিম ব্যবধান: দুই মানসপটের মাঝে এক অলঙ্ঘ্য দূরত্ব

অধ্যায় ১ : প্রথম স্ফুলিঙ্গ - *কবির নিভৃত হৃদয়ের প্রথম অলোড়ন*

লেখক ও পাঠকের মাঝে 'ভাষা' একমাত্র সাঁকো হতে পারে, কিন্তু সৃজনের এই যাত্রা ভাষার আঙিনায় শুরু হয় না। এর সূচনা আরও অনেক আগে—চেতনার এমন এক নিভৃত গহীনে, যেখানে শব্দেরা তখনও জন্ম নেয়নি। কলম কাগজ স্পর্শ করার আগে, কিংবা প্রথম পঙক্তিটি রচিত হওয়ারও বহু আগে, কবির অন্তরে কিছু একটা ঘটে যায়। ঠিক কখন ঘটে, কিভাবে ঘটে তা কবি বুঝে উঠতে পারেন না। এ যেন দূর্লভ কোন একাকী মুহূর্তে কোন ঐশি বাণীর অবতীর্ণ হওয়া, এ যেন অপ্রত্যাশিত কোন মুহূর্তের এক অলিক জাদুস্পর্শ। এই শুরুর লগ্নটি অতি সূক্ষ্ম , নাজুক। এটা প্রায়শই অলক্ষিত, অধরা , অথচ এর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সমগ্র সৃষ্টির ভার। তাই লেখা কেবল নিজেকে প্রকাশ করার মাধ্যম নয়; বরং এটি এক রূপান্তরের প্রক্রিয়া, যেখানে এক অস্পৃশ্য 'অরূপ' ক্রমশ 'রূপে'র দিকে ধাবিত হয়।

সেই মৌন স্তব্ধতায় ভাবনার প্রথম স্ফুলিঙ্গটি জ্বলে ওঠে। সেটি কোনো সুসংগত চিন্তা বা সুগঠিত বাক্য হয়ে আসে না। আসে এক তীব্র অনুভূতি বা এক

রহস্যময় অস্তিত্ব হিসেবে, যা কেবল অনুভব করা যায় কিন্তু সংজ্ঞায়িত করা যায় না। এটা চেষ্টা করে দখলে আনা যায়না , বরং তা আপন মনেই ধরা দেয় । এই মুহূর্তটি বিরল এবং পরম পবিত্র। ভাবনার তখন কোনো নির্দিষ্ট অবয়ব নেই, অথচ তার মধ্যেই এক অদ্ভুত পূর্ণতা বিরাজমান। সে নির্বাক থেকেও কথা বলে এবং ব্যাখ্যা ছাড়াই সবকিছু উন্মোচিত করে।

এই স্তরে কবি কেবল অনুভব করতে পারেন, বিশ্লেষণ নয়। সেই ভাব এতটাই কোমল যে সরাসরি অক্ষরের খাঁচায় বন্দি হতে চায়না । এটি বাতাসে ভেসে থাকা সুবাসের মতো, যার ঘ্রাণ অনুভব করা যায়, কিন্তু মুঠোয় বন্দি করা যায় না। একে যত জাপটে ধরার চেষ্টা করা হয়, ততই তা আলগা হয়ে যায়। তাই কবি তখন স্তব্ধ ও নিবিষ্ট থাকেন। তিনি সেই ভাবকে তার আপন কক্ষপথেই থাকতে দেন, জোর করে অক্ষরের শৃঙ্খলে বাঁধেন না। এই অবস্থায় তিনি একজন "Creator" এর চেয়েও বেশি হয়ে ওঠেন এক 'Receiver', তিনি একজন কারিগরের চেয়েও বড় এক 'নীরব সাক্ষী' তে পরিণত হয়ে উঠেন।

ভাবনার এই প্রথম জন্মটি একদম অকৃত্রিম। এটি ভাষার সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত এবং প্রকাশের চাপ

থেকে অস্পর্শিত। স্থির জলে প্রতিফলিত পূর্ণিমার চাঁদের মতো সে এক শান্ত নিখুঁত অবস্থায় বিরাজ করে। তবে এই নির্মলতাই তাকে ভঙ্গুর করে তোলে। কবি টের পান, একে শব্দের খাঁচায় বন্দি করতে গেলেই হয়তো তার প্রাণভোমরাটি হারিয়ে যাবে। এই উপলব্ধি কবির ভেতরে এক নিভৃত টানাপোড়েন তৈরি করে। তিনি যুগপৎ বিস্ময় ও শঙ্কায় দুলতে থাকেন—বিস্ময় জাগে সেই অশরীরী ভাবের সৌন্দর্য দেখে, আর শঙ্কা জাগে তাকে বেশী করে পাওয়ার চেষ্টায় আরও বেশী করে হারিয়ে ফেলার ভয়ে।

এই ভাবনার উৎস কখনোই ধরাবাঁধা নয়। এটি আনন্দ, বেদনা, এক টুকরো স্মৃতি কিংবা একান্ত নিভৃত কোনো মুহূর্ত থেকেও উৎসারিত হতে পারে। কিন্তু উৎস যা-ই হোক না কেন, অভিজ্ঞতাটি চিরকালের। এটা কোন আবিষ্কার নয়, বরং বিশ্বজনীন কোনো গূঢ় রহস্যের উন্মোচন। কবি নিজেকে সেই ভাবনার মালিক মনে করেন না; মনে করেন কেবল এক মাধ্যম।

এই সন্ধিক্ষণে ভাবনা কোনো যুক্তি মানে না। এটি ধাপে ধাপে বা তর্কের মাধ্যমে আসে না। এটি এক অবিভাজ্য স্বত্বা হিসেবে বিরাজ করে। যুক্তির চেয়েও

এটি বেশী আবেগের , বিশ্লেষণের চেয়েও বেশি বিস্ময়ের । আর ঠিক এই কারণেই সে ভাষাকে অস্বীকার করে, শব্দের শৃংখলে ধরা দেয়না । শব্দ ভাঙ্গতে চায় , সংজ্ঞায়িত করতে চায়; কিন্তু সেই ভাবনা মেঘের মতো প্রবহমান ও পরিবর্তনশীল—যা প্রতি মুহূর্তে রূপ বদলায় কিন্তু তার সত্ত্বা হারায় না।

এই পর্যায়ে কবির কাজ যেমন সহজ, তেমনি দুঃসাধ্য। তাকে সেই অনুভূতির খুব কাছাকাছি থাকতে হয়, অথচ তাকে অধিকার করা চলে না। তাকে আগলে রাখতে হয়, কিন্তু শাসন করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন অসীম ধৈর্য এবং একাগ্রতা। একটু অসতর্ক হলেই ভাবনাটি মিলিয়ে যেতে পারে। আবার একটু বেশি বাড়াবাড়ি করলেও সে তার সহজাত রূপ হারিয়ে ফেলে। তাই কবি কেবল প্রতীক্ষায় থাকেন সঠিক মুহূর্তির জন্য , আর তার অন্তরে সেই মৌন আলোড়নের সাক্ষী হয়ে থাকেন। এই মুহূর্তটি কবির একান্ত নিজের। এই মুহূর্তটি পাঠকের কাছে চিরকাল অগোচরেই থেকে যায়। কবির সেই নিভৃত হৃদয়ের অন্দরমহলে অন্য কারও প্রবেশাধিকার নেই। এটি কেবল কবির একান্ত নিজস্ব । পাঠক কেবল লিখিত শব্দগুলোই দেখেন, কিন্তু সেই নিঃশব্দ শুরুর সাক্ষী হতে পারেন না।

তবুও ভাবনা অনন্তকাল মৌন থাকতে পারে না। বীজের মতোই তার ভেতরে লুকিয়ে থাকে অঙ্কুরিত হওয়ার এক প্রবল তৃষ্ণা। সেই আদিম নীরবতা তখন এক মৃদু অস্থিরতায় রূপ নেয়। কবি বুঝতে পারেন, সেই অরূপ ভাবনা এবার রূপ পরিগ্রহ করতে চাইছে। এভাবেই শেষ হয় কাব্য সৃষ্টির প্রথম পর্যায়।

অধ্যায় ২ : অন্তর্নিহিত আর্তি - অরূপের রূপ পরিগ্রহের ব্যাকুল আকাংখা

সেই আদি স্ফুলিঙ্গ বেশিক্ষণ স্থির থাকে না। যা একসময় শান্ত উপস্থিতি হিসেবে ছিল, তা ধীরে ধীরে কবির ভেতরে এক জীবন্ত শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। যে ভাবনাটি একদা ছিল প্রশান্ত , তা এখন চঞ্চল হতে শুরু করে। সে আর নিভৃত মৌনতায় লুকিয়ে থাকতে চায় না। তার ভেতরে এক মৃদু অথচ অবিরাম আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে—বাইরে আসার, রূপ পরিগ্রহ করার এবং মূর্ত হওয়ার। এই পরিবর্তন আকস্মিক নয়, কিন্তু অবধারিত। কবি অনুভব করেন এটি ক্রমশ বাড়ছে, ঠিক যেন এক অদৃশ্য চাপের মতো যাকে আর উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

এই পর্যায়ে ভাবনাটি কেবল একটি অনুভূতিতে সীমাবদ্ধ থাকে না; তা এক অপরিহার্য প্রয়োজনে পরিণত হয়। সে এখন কবির সমস্ত মনোযোগ দাবি করে। কবি চাইলেও এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন না। বিরাম কিংবা ব্যস্ততা—সব মুহূর্তেই তা কবির পিছু নেয়, ফিরে ফিরে আসে। এটি যেন দরজায় এক অবিরত মৃদু করাঘাত, কিংবা কোনো সুদূর আহ্বান যা সময়ের সাথে সাথে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কবির ভেতরে এক অস্থিরতা দানা বাঁধে—এটি

কোনো অভাববোধ থেকে নয়, বরং অন্তরের কোনো এক সৃষ্টির অবমুক্ত হওয়ার অস্থিরতা।
এই অস্থিরতা সাধারণ নয়; এটি নিভৃত কিন্তু গভীর। এটি মনকে ভেঙে ফেলে না, বরং আচ্ছন্ন করে রাখে। বাহির থেকে কবিকে শান্ত দেখালেও তার অন্তরে চলতে থাকে এক নিরন্তর দহন। ভাবনাটি মৌনতার দেয়ালে করাঘাত করে তার নিজস্ব অবয়ব চায়। সে আর কেবল অনুভূত হয়ে তৃপ্ত নয়; সে এখন প্রকাশিত হতে চায়। এই বাঁকবদলই কাব্যসৃষ্টির এক নতুন পর্যায়, যেখানে 'অদৃশ্য' ধীরে ধীরে 'দৃশ্যের' দিকে ঝুঁকে পড়ে।

কবি এখন এক নাজুক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। তিনি ভাবনার ভার অনুভব করছেন, অথচ জানেন না কীভাবে তাকে শব্দের শরীরে সঞ্চালন করবেন। যা তিনি অনুভব করছেন আর যা তিনি বলতে পারছেন—এই দুইয়ের মাঝে এক সূক্ষ্ম ব্যবধান থেকে যায়। এই ব্যবধান এক ধরনের বেদনার জন্ম দেয়—তীব্র নয়, কিন্তু ধ্রুব। এ যেন বৃষ্টি নামার আগের গুমোট এক থমথমে অবস্থা; আকাশ ভারাক্রান্ত, অথচ মেঘের অভিমান তখনও ভাঙ্গে নি। কবি বুঝতে পারেন কোনো একটা কিছু ঘটতে চলেছে, কিন্তু তার সুনির্দিষ্ট রূপটি তিনি জোর করে ফুটিয়ে তুলতে পারেন না।

এই ব্যথা কোনো বোঝা নয়; এটি প্রাণের স্পন্দন। এটি প্রমাণ করে যে ভাবনাটি সজীব এবং সে ভূমিষ্ঠ হতে চাইছে। মায়ের জঠরে ভ্রূণ যেমন নিঃশব্দে বেড়ে ওঠে কিন্তু বেরিয়ে আসার এক প্রবল ইচ্ছা পোষণ করে, এই ভাবনাটিও তেমনি। কবি সচেতন হন যে তিনি এমন কিছু ধারণ করছেন যা চিরকাল ভেতরে রাখা সম্ভব নয়। এটি যত দেরি করে, সেই সৃজন-চাপ ততই প্রবল হয়। একেই বলা যেতে পারে সৃষ্টির 'প্রসব-বেদনা'।

এই অবস্থায় কবি সাধারণ কোনো কাজে শান্তি খুঁজে পান না। তার চিন্তা বারবার সেই একান্ত অন্তঃস্থ অস্তিত্বের কাছে ফিরে যায়। বাহিরের জগতে তিনি হাসেন, কথা বলেন, কিন্তু অন্যের সাথে কথা বলার সময়ও যেন তার একটি অংশ অবচেতন অন্য কোন জগতে পড়ে থাকে। ভাবনাটি তাকে একা ছাড়ে না। এটি তার মেজাজ, মনোযোগ, এমনকি অস্তিস্তকেও আচ্ছন্ন করে ফেলে। মুহূর্তগুলো তখন অনেক ভারী মনে হয়, যেন কোনো কিছুর উন্মোচনের প্রতীক্ষায় তারা থমকে আছে।

তবুও, ভাবনাটি নিজেকে পুরোপুরি প্রকাশ করে না। সে কোনো স্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেয় না; কেবল প্রকাশের এক তীব্র তাড়না তৈরি করে। কবিকে তখন খুঁজতে হয় সঠিক পথ, সঠিক মুহূর্ত এবং ভাষায়

প্রবেশের সঠিক দুয়ার। এই অন্বেষণ সব সময় সহজ বা পরিষ্কার হয় না। এর জন্য প্রয়োজন ধৈর্য, অপেক্ষা । আবার মাঝেমধ্যে এই পথ বয়ে আনে সংশয়। কবির মনে হয় তিনি খুব কাছাকাছি এসেছেন , কিন্তু পৌঁছাতে পারেন নি। তিনি ভাবনার উপস্থিতি টের পান, কিন্তু তাকে স্থায়ীভাবে নিজের দখলে আনতে পারেন না ।

এই পর্যায়ের গভীরে এক গোপন শঙ্কাও লুকিয়ে থাকে। কবি জানেন যদি তিনি খুব বেশি দেরি করেন, তবে ভাবনাটি হয়তো তার সজীবতা হারিয়ে ম্লান হয়ে যাবে। আবার যদি খুব তাড়াহুড়ো করেন, তবে হয়তো তার অন্তর্নিহিত গভীরতা হারিয়ে যাবে। তাই প্রতীক্ষা আর কাজের মাঝে এক সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়।
ভাবনার নিজস্ব একটি সূক্ষ্ণ ছন্দ আছে। কবির কাজ হলো মনের কান দিয়ে গভীরভাবে সেই ছন্দের আবেশ টা পর্যবেক্ষণ করা , আর সঠিক মুহূর্তের অপেক্ষা করা - যাতে সেই আবেশটা পরিপক্ক হওয়ার সময় পায় । অতঃপর সেই ভাবনাটিই তার নিজস্ব মৌন উপায়ে কবিকে পথ দেখাতে শুরু করে। এটি কবির মনঃসংযোগ গড়ে তোলে, তাকে সুনির্দিষ্ট কিছু শব্দচয়ন, দৃশ্যপট বা স্মৃতির দিকে ধাবিত করে। সে

যেন নিজের প্রকাশের ভূমি নিজেই প্রস্তুত করে। কবি হয়তো এই প্রক্রিয়াটি পুরোপুরি বোঝেন না, কিন্তু এর গতিপথ অনুভব করতে পারেন। মনে হয় যেন ভাবনাটি তার নিজের 'হয়ে ওঠার' নকশাটি নিজের ভেতরেই বহন করছে।

এই স্তরটি যেমন টানাপোড়েনে ঠাসা, তেমনি অর্থবহ। কবির এই বেদনা বৃথা নয়; এটি সৃজনশীল। এর ভেতরেই লুকিয়ে থাকে রূপ পরিগ্রহের প্রতিশ্রুতি। এই সৃজন-চাপ না থাকলে ভাবনাটি চিরকাল মৌন থাকতো। এই অস্থিরতা না থাকলে প্রকাশের অভিমুখে কোনো যাত্রা হতো না। তাই এই অস্থিরতাটুকু কেবল প্রয়োজনই নয়, বরং মূল্যবান।
পাঠক আবারও এই অভিজ্ঞতার বাইরেই থেকে যান। একজন পাঠক কবি-হৃদয়ের সেই টানাপোড়েন, অনিশ্চয়তা, অস্থিরতার সাক্ষী হতে পারেন না। তিনি কেবল পুরো প্রক্রিয়া শেষের পরিশালিত ও পরিমার্জিত শব্দগুলোই দেখেন, হয়ত তার আবেগও অনুভব করেন, কিন্তু কবির এই ভেতরের সংগ্রামটি তার অদেখা থেকে যাবে। তিনি সেই সৃজন-চাপের ধীর সঞ্চার, ভাবনার সেই নীরব অন্তর্দহন কিংবা কবির সেই সতর্ক প্রতীক্ষার প্রহর—কিছুই টের পাবেন না। যাত্রার এই অংশটুকু গোপনই থাকে যাবে।

সৃজনশীলতার চাপ যখন চরমে পৌঁছায়, কবি আর নির্বকার থাকতে পারেন না। প্রকাশের অভাববোধ তখন হারানোর ভয়কেও ছাপিয়ে যায়। যে নিস্তব্ধতা একদা ভাবনাকে আগলে রেখেছিল, তা এবার ভাঙতে শুরু করে। কবির ভেতরে এক প্রবল তাগিদ জাগে সক্রিয় হওয়ার—এমন কিছুকে আঁকড়ে ধরার যা তার অনুভবের ভার সইতে পারে। আর সেই পরম মুহূর্তে সৃষ্টির পরবর্তী পদক্ষেপটি অনিবার্য হয়ে ওঠে। কবির ভিতরের কবিসত্ত্বা জেগে ওঠে । কবি কলম হাতে তুলে নেন।

অধ্যায় ৩ : মুক্তির আবাহন - যখন কলম প্রথম কথা বলে ওঠে

যে মুহূর্তটি এতকাল কবির ভেতরে সংগোপনে দানা বাঁধছিল, তা এবার এক শান্ত ধ্রুবতায় উপস্থিত হয়। অন্তরের সেই সৃজন-চাপ, যা একদা ছিল মৃদু ও সুদূর, তা এখন এতটাই সংহত যে সক্রিয় হওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই। কবি আর কেবল সেই ভাবনার সাক্ষী হয়ে থাকতে পারেন না; তাকে এখন হতে হবে সেই ভাবের এক সক্রিয় আধার। যে নিস্তব্ধতা ভাবনাটিকে আগলে রেখেছিল, তা এবার এক প্রবল কেন্দ্রবিমুখী চাপের মুখে তার বন্ধ দুয়ার খুলে দেয়; কবি ভাষার দিকে হাত বাড়ান—পুরো আত্মবিশ্বাস নিয়ে নয়, বরং এক অমোঘ সাহস বুকে নিয়ে।

লেখার এই শুরুর লগ্নটি কোনো নিখুঁত ঝরনাধারার মতো নয়। এটি শুরু হয় একটি প্রচেষ্টার মাধ্যমে। কবি কলম ধরেন ঠিক সেভাবে, যেভাবে একজন শিল্পী কোনো অদৃশ্য অশরীরী বস্তুকে রূপ দেওয়ার জন্য রংতুলি হাতে তুলে নেন। প্রথম পদচারণায় এক দ্বিধা থাকে, সংশয় থাকে। হাত থেমে যায়, মন খুঁজে ফেরে সঠিক শব্দ, আর অনুভূতি যেন প্রতীক্ষায় থাকে। মুহূর্তকালের জন্য সমস্ত কিছু যেন এক সন্ধিক্ষণে

এসে থমকে দাঁড়ায়—অন্তরের গহিনে চেনা সেই প্রথম অনুভূতি আর বাইরের জগতের অনাগত রূপান্তরের সেই নিভৃত মোহনায়।

তারপর প্রথম শব্দটি ভূমিষ্ঠ হয়। হয়তো এটি সঠিক শব্দ নয়; হয়তো এটি সেই ভাবনার সমগ্র ভার বহন করতে পারছে না। তবুও, এটি প্রথম নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দেয়। একটি পথ খুলে দেয়। কবি এক চিলতে মুক্তির আস্বাদ পান, যেন এক সংকীর্ণ দুয়ারের শৃংখল খুলে গেল আর কবি মুক্ত বাতাসে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিলেন। ভেতরে যা অবরুদ্ধ ছিল, তা এখন খোলা দরজা দিয়ে অবমুক্ত হওয়ার পথ খুঁজে পেল।

শব্দের পর শব্দ যখন ঝর্ণাধারার মতো নেমে আসে, তখন সমগ্র সৃষ্টিপ্রক্রিয়াই এক সজীব ছন্দের কলতানে মুখর হয়ে ওঠে। কবি অনবরত অনুভবের গভীরতা আর ভাষার ঐশ্বর্যের মাঝে এক সেতুবন্ধন রচনার নিরন্তর প্রয়াস চালান। তিনি এমন শব্দের অন্বেষণে নিমগ্ন হন যা তাঁর ভাবনার গভীরতাকে ধারণ করতে সক্ষম; কিন্তু অচিরেই উপলব্ধি করেন যে, তাঁর হৃৎস্পন্দনের তীব্রতা কোনো শব্দেই পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় না। প্রতিটি বাক্য কিছু সত্যকে মূর্ত করে ঠিকই, কিন্তু অলক্ষ্যে তার চেয়েও বিশাল কিছু অপ্রকাশিত থেকে

যায়। প্রতিটি বাক্য কিছু অংশকে আলোকিত করে, অথচ তারই ফাঁকে রেখে যায় অদৃশ্য অনুচ্চারিত এক বিস্তৃত শূন্যতা। তবুও, তিনি অদম্য—তবুও কবির কলম থামে না; কারণ সৃষ্টির এই নেশায় স্তব্ধ হওয়ার পথ যে আজ রুদ্ধ।

কবির জন্য লেখার এই স্তরটি একই সাথে যেমন স্বস্তির, তেমনি সংগ্রামের। প্রতিটি পঙক্তি লেখার সাথে সাথে অন্তরের চাপের কিছুটা মুক্তি ঘটে ঠিকই, কিন্তু প্রকাশের সেই চেষ্টা আবার এক নতুন ধরনের টানাপোড়েন তৈরি করে। কবি একই সাথে হালকা এবং ভার বোধ করেন। হালকা—কারণ কিছু একটা প্রকাশিত হচ্ছে; ভার—কারণ আদি মূল অনুভূতি আর তার প্রকাশিত রূপের মধ্যে ব্যবধানটি এখন আরও স্পষ্ট হয়ে ধরা দিচ্ছে।

কলম চলে, তবে অবলীলায় নয়। এটি চলে সাধনা দিয়ে, মমতা দিয়ে এবং বারবার ঘষে-মেজে। কবি শব্দ বুনে যান, পরক্ষণেই থমকে দাঁড়ান, পুনরায় ফিরে তাকান স্বরচিত পঙক্তিমালায়। একটি শব্দ বদলান, কোনো বাক্যাংশ মুছে দেন, নতুন একটি পঙক্তি যোগ করেন। এটি কেবল সংশোধন নয়; এটি এক নিবিড় সান্নিধ্যের খোঁজ। তিনি চাইছেন লিখিত রূপটিকে

আদি অনুভূতির যতটা সম্ভব কাছাকাছি নিয়ে যেতে, যদিও তিনি ভালো করেই জানেন যে এই ব্যবধান কখনোই পুরোপুরি মুছে ফেলা সম্ভব নয় ।

মাঝেমধ্যে শব্দরা খুব সহজেই ধরা দেয়, যেন ভাবনাটি নিজেই কবির কলমকে পথ দেখাচ্ছে। এমন মুহূর্তে কবি তার অনুভব আর কলমের মাঝে এক ক্ষণিক ভারসাম্য খুঁজে পান। প্রবাহটি হয়ে ওঠে মসৃণ, একদম সহজাত। কিন্তু এই পথচলা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। অচিরেই পুনরায় সেই সৃজন-সংগ্রাম ফিরে আসে। শব্দগুলো অনুভূতির ভার সইতে না পেরে ফ্যাকাশে হয়ে যায়, প্রতিটি বাক্য অপূর্ণ মনে হয়—আর কবিকে আবারও সেই অন্বেষণ, পরিমার্জন আর নিরন্তর পথচলার সাধনায় নিমগ্ন হতে হয়।

সহজ আর কঠিনের এই দোলাচলের মধ্যে দিয়েই সৃজন-প্রক্রিয়া এগিয়ে চলে। এটি প্রমাণ করে যে লেখা মানে কেবল একটি তথ্য স্থানান্তর নয়, বরং দুটি জগতের মধ্যে এক গভীর নিবিড় বোঝাপড়া—অনুভূতির সেই মৌন অশরীরী জগত আর ভাষার সেই দৃশ্যমান কাঠামোগত জগত। কবি এই দুই মেরুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এক সুদক্ষ

কারিগরের ন্যায় তাঁর সীমিত সামর্থ্য দিয়ে এক সেতুবন্ধন রচনার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যান।

কবির কলম যতই অগ্রসর হয়, প্রকাশের অন্তরালে যা কিছু হারিয়ে যাচ্ছে—সেই রিক্ততার বোধ ততই তাঁকে আচ্ছন্ন করে। সেই আদি ও অকৃত্রিম ভাবনা, যা একদা ছিল অখণ্ড ও অমলিন, তা এখন খণ্ড-বিখণ্ড হতে শুরু করে। কিছু অংশ প্রকাশের আলোয় উদ্ভাসিত হয়, আর কিছু থেকে যায় নিভৃত অন্ধকারের অন্তরালে। কোনো কোনো ভাব এই রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় শ্রীহীন হয়ে পড়ে, আবার কোনোটি ধারণ করে ভিন্ন এক অবয়ব। কবি চোখের সামনে এটি ঘটতে দেখেন, অথচ তিনি নিরুপায়। প্রকাশ মাত্রই এই বিসর্জন দাবি করে।

তবুও, এখানে প্রাপ্তিও আছে। যা একদা ছিল অদৃশ্য, তা এখন রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করেছে। ভাবনাটি কিছুটা পরিবর্তিত হলেও এখন তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়ার যোগ্য হয়েছে। সে কবির ব্যক্তিগত নিভৃত জগত থেকে বেরিয়ে এসে এমন এক রূপ নিয়েছে যাকে অন্যরা দেখতে পারে, পড়তে পারে এবং স্পর্শ করতে পারে। এই রূপান্তর নিখুঁত নয়, কিন্তু অনিবার্য।

কবির সৃজনশীল কলম ততক্ষণই বহমান থাকে, যতক্ষণ না তাঁর হৃদয়ের সেই গহিন চাপ এক প্রশান্তিতে রূপ নেয়। তা সম্পূর্ণ নির্মূল হয় না সত্য, তবে বিশ্রামের অবকাশটুকু অন্তত মেলে। রচনার এই মহাযজ্ঞ তখন এক সাময়িক যতিচিহ্নে এসে দাঁড়ায়। যে মৌন ভার একদা কবির মানসপটে গুমরে মরছিল, শ্বেতশুভ্র কাগজ আজ তারই আধার। অতীন্দ্রিয় সেই ভাব আজ মূর্ত হয়ে উঠেছে—যদিও এই রূপান্তরের পথে সে হারিয়েছে তার আদিম রূপের কিঞ্চিৎ আভা।

কবি যখন তাঁর লেখার দিকে তাকান, তখন সেখানে কোনো পূর্ণাঙ্গ সাফল্য দেখতে পান না। তিনি দেখেন একটি সৎ ও যত্নশীল প্রচেষ্টা—যার সীমাবদ্ধতা অনস্বীকার্য। তিনি জানেন আদি ভাবনাটি ছিল আরও বিশাল, আরও গভীর, আরও পূর্ণ। কাগজের বুকে যা পড়ে আছে তা কেবল তার একটি ভগ্নাংশ মাত্র—যা ভাষার সীমাবদ্ধতা আর প্রকাশের শর্তে বন্দি।

তবুও, এই ভগ্নাংশটুকুই সত্য। মনের বাইরে ওই ভাবনার এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো রূপান্তর সম্ভব ছিল না। এই পর্যায়ে ভেতর থেকে বাইরের এই যাত্রাটি পূর্ণ হয়। ভাবনাটি প্রথম সীমান্ত অতিক্রম করেছে। সে

কবির মৌন জগত ত্যাগ করে ভাষার দৃশ্যমান জগতে পা রেখেছে। কিন্তু যাত্রা এখানেই শেষ নয়। কাগজের বুকে এখন যা বিদ্যমান, তা কেবল সৃষ্টির 'শরীর'। তার 'আত্মা' এখনও অপেক্ষায় আছে কারও পরশ পাওয়ার। আর তার জন্য শুরু হতে হবে অন্য এক যাত্রার।

অধ্যায় ৪: শব্দের সীমাবদ্ধতা - অনুভূতির এক খণ্ডিত অবয়ব

কাব্য-ভাবনা প্রথমে জন্ম নেয় কবির অন্তরে—অদৃশ্য, অশব্দ, অথচ পূর্ণ। এটি এখন অন্তরের নিভৃত সীমানা পেরিয়ে শব্দের পোশাকে সাদা কাগজের বুকে এক দৃশ্যমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। মনে হয়, যাত্রা শেষ হয়েছে—কবি লিখেছেন, অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে, নীরবতা ভেঙেছে। কিন্তু এই পূর্ণতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক গভীর সত্য: যা লেখা হয়েছে, তা কখনোই যা প্রথমে অনুভূত হয়েছিল তার সমান নয়। কিছু একটা যেন হারিয়ে গেছে।

শব্দ শক্তিশালী, তবু সীমাবদ্ধ। সে ইঙ্গিত করতে পারে, কিন্তু ধারণ করতে পারে না। সে আভাস দিতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে আত্মস্থ করতে পারে না। যে কবি-ভাবনা একদা ছিল এক অখণ্ড সত্তা, শব্দ ও বাক্যের ব্যবচ্ছেদে তা আজ কেবল বিশ্লেষিত খণ্ডাংশ হিসেবে পরিদৃষ্ট। প্রতিটি শব্দ যেন সেই বিশাল অর্থের একেকটি কণা বহন করে মাত্র, কিন্তু সেই সামগ্রিক মহিমা বহন করার শক্তি কোনো একক শব্দেরই নেই। কবির চেতনায় এই সত্য ধ্রুব হয়ে ওঠে যে—ভাষা কোনো প্রশস্ত জলধি নয়, বরং এক বিশাল

মহাসমুদ্রকে ধারণ করার ব্যর্থ প্রয়াসে রত এক ক্ষুদ্র মৃতপাত্র মাত্র।

ঠিক এখান থেকেই এক নিভৃত অতৃপ্তির শুরু। কবি যখন নিজের লেখাগুলো পড়েন, তখন তাঁর মনে হয় কোথাও যেন কিছু একটা অপূর্ণ রয়ে গেছে। ঠিক অনুপস্থিত নয়, কিন্তু পুরোপুরি উপস্থিতও নয়। তাঁর হৃদয়ের সেই আদি অনুভূতির গভীরতা যেন কিছুটা ম্লান বা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। একদা যা মনের ভেতরে অত্যন্ত স্বচ্ছ ছিল, কাগজের পাতায় আজ তা দূরবর্তী কোনো ছায়ার মতো মনে হয়। একে তুলনা করা যায় একটি উজ্জ্বল আলোকচ্ছটার সাথে, যা একটি ঘোলাটে কাঁচের ভেতর দিয়ে আসার ফলে ম্লান হয়ে গেছে—আলোটি দেখা যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তার সেই আগের তেজ আর নেই।

ভাবনা আর তার বহিঃপ্রকাশের মধ্যকার এই ব্যবধান কেবল কবির ভাষা-দক্ষতার অভাবজনিত কারণে নয়। ভাষার ওপর অগাধ পাণ্ডিত্য থাকলেও এই দূরত্ব ঘোচানো সম্ভব নয়। এই সীমাবদ্ধতা আসলে ভাষার নিজ ধর্মের মধ্যেই নিহিত। শব্দ স্থির ও সুনির্দিষ্ট; কিন্তু ভাবনা প্রবাহমান। শব্দের অর্থ সীমাবদ্ধ; কিন্তু ভাবনার

পরিধি উন্মুক্ত। শব্দকে যেকোনো একটি পথ বেছে নিতে হয়; অথচ ভাবনার গহীনে একইসাথে বহু পথের সহাবস্থান। এই মৌলিক পার্থক্যের কারণেই কিছুটা বিসর্জন এখানে অনিবার্য হয়ে পড়ে।

কবি এই ব্যবধানটুকু ঘোচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি আরও নিপুণ, নিখুত শব্দের সন্ধান করেন, বাক্যের বিন্যাস পাল্টে দেন এবং প্রতিটি পঙক্তিকে আরও মার্জিত করে তোলেন। যা দুর্বল বলে মনে হয়, তাকে সরিয়ে তিনি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী কোনো শব্দ বা ভাব যোগ করেন। কিন্তু বহু প্রচেষ্টার পরেও সেই দূরত্বটুকু থেকেই যায়। হয়তো ব্যবধান কিছুটা কমে আসে, কিন্তু তা একেবারে মুছে যায় না। কবি উপলব্ধি করেন যে, রচনার অবয়বকে তিনি যতই উন্নত করুন না কেন, অনুভূতির সেই আদি নির্যাসকে কোনোভাবেই পূর্ণাঙ্গ রূপে ভাষায় বন্দি করা সম্ভব নয়।

এই উপলব্ধি কবি হৃদয়ে এক গভীরতর বোধের জন্ম দেয়। লেখনী মানে কোনো ভাবনার নির্ভুল রূপান্তর নয়, বরং তাকে খুব কাছ থেকে ছুঁয়ে যাওয়ার এক নিরন্তর প্রয়াস মাত্র। কবি কোনো ভাবনাকে হুবহু রুপান্তর করেন না; বরং তিনি সেটিকে অন্য এক

অবয়বে নতুন করে সৃজন করেন। এই পুনর্নির্মাণের প্রক্রিয়ায় সবসময়ই কিছু না কিছু পেছনে থাকে যায়। অনুভূতির সূক্ষ্ম কিছু আভা আর চিন্তার নিভৃত কিছু স্পন্দন চিরকালই শব্দের ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে যায়।

এটি যেন হাতের তালুতে জল ধরে রাখার এক নিরন্তর প্রচেষ্টা। কেউ যত সতর্কভাবেই তা আঁকড়ে ধরুক না কেন, কিছু অংশ আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়বেই। যা অবশিষ্ট থাকে তা বাস্তব সত্য, কিন্তু অপূর্ণ। কবি এক নিভৃত গভীরতায় এই সত্যটি অনুভব করেন। তিনি জানেন যে, তাঁর যা কিছু রচনা—তা একই সাথে সত্য, আবার একই সাথে অপূর্ণ।

ঠিক একারণেই পরম তৃপ্তি কখনো আসে না। কবিতা রচনার পর কবি হয়তো কিছুটা স্বস্তি বোধ করেন, কিন্তু পূর্ণতা পান না। তাঁর মনে হতে পারে যে তিনি কিছু একটা প্রকাশ করতে পেরেছেন, কিন্তু সবকিছু নয়। সবসময়ই মনে হয় যে ভাবনার গভীরতম অংশটি আজও না বলা রয়ে গেছে, যা লিখিত পঙক্তিগুলোর আড়ালে কোথাও নিভৃতে লুকিয়ে আছে। অভিজ্ঞতার সাথে সাথে এই অনুভূতি ম্লান হয়ে যায় না; বরং প্রতিটি সৃষ্টির সাথে এটি চিরকাল রয়ে যায়।

তবুও, এই অপূর্ণতা কেবল নেতিবাচক নয়। এটিই আসলে লেখাকে বাঁচিয়ে রাখে। ভাষা যদি ভাবনার সবটুকুই নিখুঁতভাবে ধরে ফেলতে পারত, তবে নতুন করে খোঁজার বা উন্মোচনের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। এই ব্যবধানটুকু যন্ত্রণাদায়ক হলেও, তা এগিয়ে যাওয়ার, বিকশিত হওয়ার এবং নিরন্তর প্রচেষ্টার এক অবকাশ তৈরি করে দেয়। এটিই কবিকে প্রকাশের নেশায় মগ্ন রাখে—যেখানে তিনি সবসময়ই লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু কখনোই তা পূর্ণাঙ্গভাবে স্পর্শ করতে পারেন না।

একই সঙ্গে, এই সীমাবদ্ধতা ভাষাকে এক অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করে। যেহেতু ভাষা সরাসরি সবকিছু বলতে পারে না, তাই সে ইঙ্গিতের মাধ্যমে রূপক ও চিত্রকল্প তৈরি করতে শুরু করে। এখানে যা বলা হয়নি, তা যা বলা হয়েছে তার মতোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রতিটি পঙক্তির ভাঁজে ভাঁজে নীরবতা এসে ভিড় করে—তবে তা কোনো শূন্যতা হিসেবে নয়, বরং এক জোরালো উপস্থিতি হিসেবে। পাঠক কেবল একগুচ্ছ শব্দই হাতে পান না, বরং তাকে সেই শব্দের সীমানা পেরিয়ে এক গভীর অনুভবের জগতে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

সৃজন-যাত্রার এই হলো দ্বিতীয় সীমান্ত—ভাষার নিজস্ব সহজাত সীমাবদ্ধতার ভেতরেই যা নিহিত । অশরীরী ভাবনা আজ এক দৃশ্যমান অবয়ব ধারণ করেছে সত্য,

কিন্তু তা করতে গিয়ে সে নিজের কিঞ্চিৎ বিসর্জনকেও মেনে নিয়েছে। অসীম যেন আজ সসীমের জঠরে প্রবেশ করেছে; আর সেই বাঁধনহীন চিরন্তন সত্তা আজ স্বেচ্ছায় এই ভাষাগত বন্ধনকে বরণ করে নিয়েছে।

সৃজন-বেদনার এই সোপানে যা আজ দৃশ্যমান, তা এক নিটোল সাহিত্যকর্ম—যা অবয়বে পূর্ণাঙ্গ মনে হলেও অন্তরাত্মায় চির-অপূর্ণ। এই সৃষ্টি এখন কবির হৃদয়ের গণ্ডি পেরিয়ে অজানার পথে পা বাড়াবে; তা গিয়ে পৌঁছাবে পাঠকের হাতে। আর সেখানেই শুরু হবে এক নতুন অভিযাত্রা—যে যাত্রা সামনের দিকে নয়, বরং শিকড়ের দিকে এক প্রত্যাবর্তনের গল্প; যা ভাষা থেকে আবার সেই নিভৃত মৌন উৎসের দিকে ধাবিত হবে, যেখানে একদা কবির মানসপটে প্রথম অনুভূতি হয়ে জন্ম লাভ করেছিল।

অধ্যায় ৫: প্রত্যাবর্তনের পথ - শব্দের শৃংখল থেকে অনুভূতিতে ফেরার যাত্রা

কবির হাত ছেড়ে লেখা যখন পাঠকের কাছে পৌঁছায়, তখন সে নতুন জীবন শুরু করে। যে অভিজ্ঞতা একসময় ছিল অন্তরের নীরব জন্ম, এখন তা দাঁড়িয়ে আছে বাহ্যিক রূপে—ভাষার বাঁধনে। কিন্তু পাঠকের দৃষ্টিসীমায় অধরা থেকে যায় কবি-হৃদয়ে অনুভূতির সেই নীরব জন্ম, অদেখা থাকে কবির সেই নীরব অন্তর্দহন ; পাঠকের হস্তগত হয় কেবল চূড়ান্ত প্রকাশ—পাতায় সাজানো শব্দ। অথচ এই শব্দের ভেতরে লুকিয়ে থাকে গভীরতা, মূল ভাবনার ছায়া, আর এক অদেখা জগৎ আবিষ্কারের অপেক্ষা।

পাঠকের কাজ সহজ নয়। তাঁকে কবির বিপরীত পথে হাঁটতে হয়। কবির যাত্রা ছিল অনুভূতি থেকে ভাষায়; পাঠককে যেতে হয় ঠিক উল্টো পথে - ভাষা থেকে অনুভূতিতে। এটি সরল পথ নয়, বরং এক অন্তর্মুখী প্রত্যাবর্তন, শিকড়ে ফেরা। পাঠক দৃশ্যমান থেকে শুরু করেন, কিন্তু তাঁকে পৌঁছাতে হয় অদৃশ্যের দিকে।

পাঠের সূচনায় কেবল শাব্দিক অবয়বটুকুই পাঠকের চেতনায় ধরা দেয়। তিনি শব্দে শব্দে হেঁটে যান,

বাক্যের বিন্যাস বোঝেন এবং একটি স্থূল অর্থ খুঁজে পান। এই পর্যায়টি সাবলীল ও অনায়াস। কিন্তু এই আবরণের নিচেই শায়িত আছে এমন কিছু নিগূঢ় স্তর, যা সহসা আত্মপ্রকাশ করে না। রচনার প্রকৃত মাধুর্য কেবল ব্যক্ত হওয়া বাণীর মাঝে নয়, বরং তার ইঙ্গিত এবং দুই পঙক্তির মধ্যবর্তী নীরবতায় নিহিত। এই অতলস্পর্শী গভীরতাকে ছুঁতে হলে পাঠককে কেবল অক্ষরের পাঠ নিলে চলে না। তাকে ক্ষণে ক্ষণে থমকে দাঁড়াতে হয়, অনুধ্যান করতে হয় এবং হৃদয়ে তা ধারণ করতে হয়।
এভাবেই ধীরে ধীরে পাঠ করার কাজটি যেন কবি-হৃদয়ের সাথে পাঠকের একটি সৃজনশীল অংশীদারিত্ব হয়ে ওঠে। পাঠক এখানে নিছক দর্শক নন। তাকে তাঁর নিজস্ব অনুভূতি, জীবনবোধ এবং একাগ্রতাকে সেই রচনার সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। নিছক শব্দরাজি কোনো প্রাণ পায় না, যতক্ষণ না পাঠকের অন্তরের স্পন্দন তাকে সজীব করে তোলে। কেবল তখনই সেই রচনার অন্তঃপুর উন্মোচিত হতে শুরু করে।

এই পথচলা প্রায়শই অনিশ্চয়তায় ঘেরা। পাঠক হয়তো কোনো মুহূর্তে অর্থের খুব কাছাকাছি পৌঁছে যান, আবার পরক্ষণেই নিজেকে আবিষ্কার করেন

যোজন যোজন দূরে। কোথাও সবকিছু স্বচ্ছ ও দীপ্যমান, আবার কোথাও কুয়াশাচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট। পাঠক অবিরত এগিয়ে যান, পুনরায় পিছু ফেরেন, আবার নতুন করে যাত্রা শুরু করেন—ছিন্নবিচ্ছিন্ন খণ্ডগুলোকে একটি পূর্ণ অবয়বে গাঁথবার ব্যাকুলতায়। এ যেন অরণ্যের মাঝে এক ক্ষীণ পদরেখা অনুসরণ করে চলা, যেখানে গন্তব্য সর্বদা দৃষ্টিগোচর নয়, কিন্তু যাত্রার বিরাম নেই।

এই জটিলতার মূলে রয়েছে ভাষার নিজস্ব প্রকৃতি। কবি যেমন তাঁর আদিম ভাবনার স্ফুলিঙ্গকে পূর্ণাঙ্গরূপে শব্দে বন্দি করতে পারেন নি, পাঠকের পক্ষেও তার আদি-সত্তা উদ্ধার করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। পাঠকের হাতে যা পৌঁছায়, তা ইতিমধ্যেই একটি ছাঁচে ঢালা এবং সংকুচিত প্রতিচ্ছবি মাত্র। এই পরিমিতি বা সীমানার ভেতরে অবস্থান করেই তাঁকে অনুধাবন করার চেষ্টা করতে হয় সেই অসীমকে, যা এই গণ্ডির ওপারে বিরাজমান। আর এই কারণেই এই অন্বেষণ অসম্পূর্ণ জেনেও শেষাবধি এক গভীর ব্যঞ্জনায় সার্থক হয়ে ওঠে।

কবিতা পাঠের সময় কখনো কখনো পাঠক ও কবি-হৃদয়ের মধ্যে এক অলৌকিক নৈকট্যের সেতুবন্ধ

রচনা হয়। কোনো একটি চরণ হয়তো হৃদয়ের গহীন-দুয়ারে করাঘাত করে, কোনো একটি শব্দ খুলে দেয় কোনো এক নিভৃত দুয়ার, আবার অতি সামান্য একটি শব্দও ধারণ করে একটি সমগ্র অনুভূতি বিশালতা। এমন সন্ধিক্ষণে লেখক ও পাঠকের মধ্যকার বিচ্ছেদ-রেখাটি যেন অলক্ষ্যে লুপ্ত হয়ে যায়; পাঠকের বোধ হয়, তিনি যেন কবি-হৃদয়ের অন্তরতম হৃদস্পন্দনটুকু খুব কাছ থেকে শুনতে পাচ্ছেন। এই দুর্লভ লগ্নসমূহ কদাচিৎ ধরা দিলেও, এই ক্ষণস্থায়ী প্রাপ্তিটুকুই যেন অন্বেষণের দীর্ঘ পথচলাকে এক অক্ষয় সার্থকতার পরশ দান করে।

কিন্তু এই নিবিড়তম মুহূর্তেও সংযোগটি নিখুঁত হয়ে ওঠে না। কবির সেই হুবহু অনুভূতিতে পাঠকের প্রবেশাধিকার মেলে না; তিনি আপন হৃদয়ের রঙ মিশিয়ে তার এক নিজস্ব প্রতিচ্ছবি তৈরি করে নেন। একই বাক্য তাই ভিন্ন ভিন্ন পাঠকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন বারতা নিয়ে আসে। গন্তব্য এক হলেও প্রত্যেকের পথচলা স্বতন্ত্র, কেউ কারো পথকে হুবহু অনুকরণ করে না। আর এই ভিন্নতাই যাত্রার সার্থকতা; কারণ এই পথচলাটি কোনো যান্ত্রিক অন্বেষণ নয়, এটি আপাদমস্তক ব্যক্তিগত এক অভিযাত্রা।

কবিতার শব্দগুলো এখানে কেবল রাস্তার পাশে দাঁড়ানো দিক-নির্দেশক সাইনবোর্ডের মত কাজ করে, কোনো পূর্ণাঙ্গ মানচিত্রের মত নয়। এটি আঙ্গুল দিয়ে গন্তব্যের দিক দেখায় বটে, কিন্তু পাঠকের সাথে সাথে পথ চলে গন্তব্যে পৌঁছে দেয় না। শব্দের দেওয়া সূত্রগুলো ধরে পাঠককে প্রতিটি পদক্ষেপ নিজেকেই ফেলতে হয় । প্রতিটি পাঠকের পথ তাই তার নিজস্ব সৃষ্টি । আর এভাবেই প্রতিটি পাঠ হয়ে ওঠে এক একটি সক্রিয় সৃজনশীলতা, যা নিছক অর্থ বোঝার চেয়েও বহুগুণ বেশি।

তবে কিছু সীমাবদ্ধতা পাঠক কখনোই অতিক্রম করতে পারেন না। কবি-হৃদয়ে সৃষ্টির সেই প্রথম পরম মুহূর্তটি ফুরিয়ে যাওয়ার পরই তাঁর যাত্রা শুরু। সৃষ্টির সেই প্রথম পরম মুহূর্তটি শুধু একবারই ধরা দেয়, এটার পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয় । তাই সেই কবি-হৃদয়ের সেই আদি উদ্দীপনা বা সেই মৌন উন্মোচনের আস্বাদ পাঠকের পক্ষে সরাসরি পাওয়া অসম্ভব। তিনি শুধু শব্দের জানালা দিয়ে সেই আদি উৎসকে পরোক্ষভাবে অনুভব করেন মাত্র । সবচেয়ে কাছে গিয়েও সেই আদিম বিন্দুটি তাঁর কাছে চিরকালই ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়।

এতে লেখক ও পাঠকের মধ্যবর্তী স্থানে এক নিভৃত শূন্যতার সৃষ্টি হয়। তারা সংযুক্ত হয়েও যেন স্বতন্ত্র। ভাষা তাদের মাঝে একইসাথে এক সেতুবন্ধন এবং এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর হিসেবে দণ্ডায়মান হয়। এটি কাছাকাছি আসার সুযোগ দেয় ঠিকই, কিন্তু পরম একাত্মতা লাভের দুয়ারটি রুদ্ধই থেকে যায়।

তবুও পাঠকের এই পথচলা থেমে থাকে না। তিনি বারবার ফিরে আসেন শব্দের কাছে, নতুন করে অনুভব করেন, নতুন করে ভাবেন। প্রতিবার ফিরে আসায় তাঁর বোধের জগৎ আরও প্রসারিত হয়। শব্দগুলো যেন একে একে তাদের খোলস উন্মোচন করে, প্রকাশ করে নতুন কোনো ব্যঞ্জনা বা গভীরতর কোনো গূঢ় অর্থ। এক নিশ্বাসে পড়ে শেষ করলেই এই যাত্রা ফুরিয়ে যায় না; পাঠকের নিজের বিবর্তনের সাথে সাথে এই ভ্রমণও পূর্ণতা পায়। এভাবেই একটি রচনা কালজয়ী হয়ে ওঠে। সেটি কেবল একটি স্থির কণ্ঠে কথা বলে না, বরং তাঁর সুর বদলে যায় সময়ের সাথে। প্রতিটি নতুন পাঠক আর প্রতিটি পাঠের মুহূর্ত সেই রচনায় যোগ করে এক নতুন গতির ঝর্ণাধারা ।

অধ্যায় ৬: অন্তিম ব্যবধান - দুই মানসপটের মাঝে এক অলঙ্ঘ্য দূরত্ব

যাত্রা এখন রূপে সম্পূর্ণ, অথচ সত্তায় অসম্পূর্ণ। এই অভিযাত্রাটি বাহ্যিক অবয়বে পূর্ণতা পেলেও এর নির্যাসটুকু রয়ে গেছে অপূর্ণ, অতৃপ্ত। কবির মানসপটে জাগা সেই প্রথম নির্বাক স্ফুলিঙ্গ থেকে পাঠকের হৃদয়ে নিবিড়ভাবে গেঁথে যাওয়া পাঠ—প্রতিটি স্তরই তার নিজস্ব সত্য, সাধনা আর সীমাবদ্ধতাকে সঙ্গী করে বিকশিত হয়েছে। যে ভাবনার জন্ম হয়েছিল নিভৃত নৈঃশব্দ্যে, প্রকাশের ব্যাকুলতা তাকে শব্দে মূর্ত করেছে; ভাষা তাকে রূপ দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু প্রকাশের সংকীর্ণতা তাকে করেছে সংকুচিত। এরপর পাঠক সেই ভাষার অবয়ব থেকে তিলে তিলে তার মূল উৎসে প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছেন। প্রতিটি পদক্ষেপে যেমন ছিল প্রাণবন্ত গতি, তেমনি প্রতিটি বাঁকে লুকিয়ে ছিল কিছু হারানোর বিষাদ। আজ এই দীর্ঘ চড়াই-উৎরাইয়ের শেষে একটি চূড়ান্ত সত্য ধীর অথচ অম্লান উজ্জ্বলতায় ধরা দিয়েছে—সত্যটি এই যে, এই সাধনা পরম অর্থবহ হওয়া সত্ত্বেও কোনোদিনও পুরোপুরি সমাপ্ত হওয়ার নয় , কখনও পরিতৃপ্ত হওয়ার নয়।

এই ধ্রুপদী সত্যের মূলে নিহিত রয়েছে এক অমোঘ বাস্তবতা: আদি ভাবনাটি তার বিশুদ্ধতম রূপে কেবল তার জন্মলগ্নেরই অর্ঘ্য। কবির অন্তরের নিভৃত গহিনে সেই নিঃশব্দ অনুভবের মুহূর্তেই তার অস্তিত্ব পূর্ণতা পেয়েছিল। সেই বিশেষ মুহূর্তটির পুনরাবৃত্তি অসম্ভব, তা অবিকল স্থানান্তরযোগ্য নয় এবং তার সমগ্রতা কোনোভাবেই অন্যকে ভাগ করে দেওয়ার নয়। এর পরবর্তী যা কিছু—লিখন, পঠন কিংবা অনুধাবন—তা কেবল সেই সত্যের নিকটবর্তী হওয়ার নিরন্তর প্রয়াস মাত্র, তাকে করায়ত্ত করার কোনো অধিকার নয়।

যখন কোনো অনুভূতি ভাষার পিঞ্জরে ধরা দেয়, তখন কবির পক্ষেও তাকে পুরোপুরি ধরে রাখা আর সম্ভব হয় না। তিনি একে গড়েন, প্রকাশ করেন এবং একটি মূর্ত রূপ দান করেন; তবে এই প্রক্রিয়ায় তিনি সেই আদি বিশুদ্ধতা হারিয়ে ফেলেন। ঠিক একইভাবে, পাঠক সেই মূর্ত অথচ ম্রিয়মাণ রূপটিকেই অবলম্বন করে সেই আদিম উৎসে ফেরার এক ব্যাকুল চেষ্টা করেন। কিন্তু কবির অভিগমণ আর পাঠকের প্রত্যাবর্তন—উভয় প্রচেষ্টাই শেষ পর্যন্ত একই গণ্ডিতে এসে বাধা পায়। সেই শাশ্বত ভাবনাটি তার আপন মহিমায় চিরকালই আমাদের অস্পর্শা , অধরা থেকে যায়।

এই-ই সেই চরম বিচ্ছেদ। এ দূরত্ব পরাজয়ের নয়, বরং এ যেন সৃষ্টিরই এক স্বভাবজাত ধর্ম। কবির শৈল্পিক দক্ষতা কিংবা সাধনার অভাব থেকে এর জন্ম নয়; এর উদ্ভব ঘটে উপলব্ধির সাথে উপস্থাপনের, স্পন্দনের সাথে অবয়বের এবং আত্মার সাথে ভাষার যে দুস্তর বিভেদ—তা থেকে। এই দুই জগত সমান্তরাল নয়, আর তাদের মেলবন্ধনও এক অসম্ভব কল্পনা। ভাষা হয়তো ভাবনার সারমর্মটুকু বহন করতে পারে, কিন্তু তার প্রাণস্পন্দনকে আপন বক্ষে ধারণ করতে পারে না। সে কেবল তর্জনী উঁচিয়ে পথ দেখাতে পারে, কিন্তু সে নিজে কখনোই সেই আত্মিক অভিযাত্রা হয়ে উঠতে পারে না।

কাব্যসৃষ্টির শেষে কবি এই সত্যের কাছে এক নিঃশব্দ নতি স্বীকার করেন। তিনি উপলব্ধি করেন, তাঁর কলমে যা ফুটে উঠেছে তা অকৃত্রিম হলেও অসম্পূর্ণ। তিনি নিজের সৃষ্টিকে অস্বীকার করেন না, আবার এতে পুরোপুরি তৃপ্তও হতে পারেন না। তাঁর অন্তরে এক নিভৃত নিবিড় বোধ জেগে ওঠে - তিনি বোঝেন যে অনুভূতির সবচেয়ে নিবিড় অংশটি বর্ণমালার এই পিঞ্জরে কখনও পুরোপুরো ধরা দেবার নয় । এই বোধ তাঁকে দুর্বল করে না; বরং সৃষ্টির এই মহাযজ্ঞ সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধিকে আরও গভীর করে তোলে।

পাঠকও ঠিক একই ধরণের এক সত্যের মুখোমুখি হন। শব্দগুলোর ভেতর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার পর, তাদের গভীরতা অনুভব করার পর এবং অর্থের সূত্র ধরে এগোনোর পর তাঁর মনে হয়—কিছু একটা আজও তাঁর ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। তিনি হয়তো সত্যের খুব কাছে পৌঁছান, হয়তো এক নিবিড় সংযোগ অনুভব করেন, তবুও তিনি জানেন যে সেই আদি উৎসের দেখা মেলেনি। তিনি যা খুঁজে পেয়েছেন তা বাস্তব ঠিকই, তবে সেটি তাঁর নিজস্ব মনের মাধুরী মিশিয়ে গড়া এক একান্ত ব্যক্তিগত উপলদ্ধি।

এভাবেই লেখক আর পাঠকের মিলন ঘটে, কিন্তু তা কখনোই পরিপূর্ণতা পায় না। তাঁরা একটি সেতুর দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকেন যা তাঁদের পরস্পরকে দেখার এবং অনুভবের সুযোগ দেয় ঠিকই, কিন্তু একে অপরের সাথে পুরোপুরি বিলীন হতে দেয় না। এই লেখনিই তখন একইসাথে সংযোগের সূত্র এবং সীমাবদ্ধতার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। এটি যেমন তাঁদের যুক্ত করে, তেমনই রাখে বিচ্ছিন্ন। এটি কাছে টানে, আবার দূরেও ঠেলে দেয়। এটি মনের দু'টি নিভৃত ভুবনকে কাছাকাছি আনলেও তাদের মধ্যকার সেই চিরন্তন ব্যবধানটুকু অপূরণীয়ই থেকে যায়।

তবুও, এই দূরত্বটুকু শূন্য নয়, রিক্ত নয়; বরং এই ব্যবধানের মাঝেই সাহিত্যের প্রকৃত সার্থকতা নিহিত। যদি অনুভূতির সবটুকুই অক্ষরের শৃংখলে বেঁধে ফেলা যেত, তবে কল্পনার আর কোনো আশ্রয় থাকতো না, ব্যাখ্যার কোনো অবকাশ থাকতো না, আর পাঠকের নিজস্ব গভীরতারও কোনো ভূমিকা থাকতো না। ভাষার এই অপূর্ণতাই এমন এক প্রাণবন্ত ক্ষেত্র তৈরি করে যেখানে অর্থের বিকাশ ঘটে, রূপান্তর ঘটে এবং তা প্রতিনিয়ত নবজীবন পায়। একারণেই একই সৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মনে নতুন নতুন ব্যঞ্জনায় কথা বলে ওঠে।

এভাবেই, প্রকাশের এই যে অপূর্ণতা—এটিই সাহিত্যকে চিরঞ্জীব করে রাখার মূল উৎস হয়ে ওঠে । কবি তাঁর ভাবকে নিংড়ে দেন না; তিনি কেবল এমন এক রূপ দেন যা অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার আমন্ত্রণ জানায়। পাঠকও সেই ভাবনাকে হুবহু ধারণ করেন না; তিনি আপন চৈতন্যে তাকে পুনর্জন্ম দান করেন। এই অর্পণ আর প্রাপ্তির মাঝখানে সর্বদাই এক নতুন সৃষ্টির উদ্ভব ঘটে—যা এককভাবে লেখক বা পাঠক কারও নয়, বরং উভয়ের সম্মিলিত হৃদস্পন্দনে স্পন্দিত।

সমাপ্ত